শতবর্ষে তিন শিল্পী

২০১৬ সালটি আমরা শুরু করেছিলাম তিনজন বিস্মৃতপ্রায় শিল্পীদের শতবর্ষের উদযাপনের মধ্যে দিয়ে। উদ্ভাসের ক্যালেন্ডার প্রকাশ হয়েছিল এই উপলক্ষ্যে। বছর শেষে সেই তিন শিল্পীকে নতুনভাবে চেনা কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত-র কলমে। তিন শিল্পী নীরদ মজুমদার, মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্খ চৌধুরীকে আর একবার ফিরে দেখা।

শতবর্ষ মানবজীবনে একটি বিশেষ মুহূর্ত। বিশেষ করে যাঁরা কৃতী মানুষ তাঁদের পক্ষে তো বটেই। যদিও বেশিরভাগ ব্যক্তিই জীবদ্দশায় নিজের একশোবছর পূর্তিকে দেখে যেতে পারেন না। তবু একশো বছরে গুণীজনের কাজকে ফিরে দেখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পরবর্তী প্রজন্ম। এই ফিরে দেখা আসলে এক ধরণের শুভচর্চা। স্রষ্টার কাজ সময়ের সম্মার্জনীকে কতটা উপেক্ষা করে টিকে থাকতে সক্ষম হল তার একটা মূল্যায়ণ করার উপযুক্ত সময় হল শতবর্ষ। যদিও আমাদের দেশে চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের নিয়ে জনসমাজে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। তার ফলে প্রায় সময়েই শিল্পীদের জীবন ও কাজ বিষয়ে তথ্য যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। হয়তো কোনো শিল্পী স্মৃতিকথা লিখে গেছেন, তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সেটি বই হয়েও বেরিয়েছে। কিন্তু কয়েকবছর পার হতে না হতেই সেই স্মৃতিকথার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। লাইব্রেরিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের হতাশ করে। তবু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন। শতবর্ষে উপনীত শিল্পীর কাজ ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে তখন। এই বছর ২০১৬-তে *উদ্ভাস* চিত্রচর্চাকেন্দ্র থেকে প্রকাশিত একটি ক্যালেন্ডারের বিষয় ছিল *শতবর্ষে তিন শিল্পী* । শিল্পীরা হলেন যথাক্রমে নীরদ মজুমদার, মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্খ চৌধুরী। প্রথম দুজন চিত্রশিল্পী, শেষের জন ভাস্কর। *উদ্ভাস*-এর উদ্দেশ্য ছিল – এই তিন শিল্পীর মুখাবয়ব সারাবছর রুচিসম্পন্ন মানুষের ঘরের দেওয়ালে পৌঁছে দিয়ে নানাজনের মধ্যে শিল্পীত্রয়ী সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা। ক্যালেন্ডার সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল করেছে জানিনা, তবে এই লেখাটিও কিন্তু সেই একই লক্ষ্যের প্রসারিত রূপ।

প্রথম শিল্পী নীরদ মজুমদার। বিখ্যাত সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের ভাই এবং স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী শানু লাহিড়ীর দাদা নীরদ মজুমদারের জন্ম কলকাতায়। ঠাকুমা যোগমায়া দেবীর স্নেহের ধন ছিলেন তিনি। তাঁর হাত ধরেই ছোটোবেলায় বাড়ির ধর্মীয়

পরিবেশ নীরদকে অনেকটা প্রভাবিত করে। সেই প্রভাব তিনি সমগ্র জীবন বয়ে বেরিয়েছেন। নীরদ মজুমদারের মা রেণুকা দেবীও ছিলেন বাড়ির সেই পরিমণ্ডলের আর এক নিবেদিত প্রাণ। বাবা প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন পুলিশ অফিসার। ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক নীরদের শৈশবকাল থেকেই ছিল। শিল্পচর্চায় বাড়ি থেকে বাধা পাননি এতটুকু। তিনি যখন 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ ভর্তি হন তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো। সোসাইটিতে ছবি আঁকায় তিনি এতটাই কৃতিত্ব দেখান যে কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'নরম্যান ব্লান্ট স্মৃতি পদক' পুরস্কার দেন। ছাত্রাবস্থায় নীরদের আদর্শ ছিলেন অননীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথের নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলীর অনুসরণে তিনি তখন ছবি আঁকতেন। কিন্তু অচিরেই এমন একটা সময় এল যখন তিনি আর সে পথে তৃপ্তি পেলেন না। বয়স বাড়ছে, বিকশিত হচ্ছে মেধা ও মনন। ইতিমধ্যে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আকাল – সব মিলিয়ে চূড়ান্ত এক অস্থিরতা। এই সময়ে এক ঝাঁক নবীন শিল্পী মিলে গড়ে তুললেন 'ক্যালকাটা গ্রুপ' (১৯৪৩সাল)। নীরদ মজুমদার ছিলেন সেই দলের অন্যতম প্রধান। 'ক্যালকাটা গ্রুপ' গঠন-পর্বে নীরদ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তাঁর চিত্রশৈলীকে সমকালীন আন্তর্জাতিক শিল্পধারার সঙ্গে মেলাতে। পল সেজান তখন তাঁর প্রিয় চিত্রশিল্পী। সেজানের বর্ণবিন্যাস নীরদকে প্রভাবিত করে ফেলে। যদিও সেজান নীরদের সমসাময়িক শিল্পী নন, তবু বিশ্বের দরবারে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয়তা। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি পেয়ে নীরদ প্যারিসে রওনা হন। সেখানে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্র ছিল আঁদ্রে লেৎ-এর অ্যাকাডেমি। প্যারিস থেকে তিনি ভ্যানগঘের দেশ হল্যাণ্ডেও যান। কিন্তু নানারকম মানসিক উদ্বেগে ও শারীরিক অনিয়মের কারণে নীরদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়। এইসময় তিনি মানসিক শান্তি ও সুস্থিরতা ফিরে পাবার জন্য নিয়মিত ভাগবৎ গীতা ও চণ্ডীপাঠ করতে শুরু করেন। ক্রমে হিন্দু ধর্মের দর্শন তাঁকে যেন নতুন এক দিশা দেখায়। তিনি খুঁজে পান নতুন এক চিত্রভাবজগৎ। ১৯৪৯-এ নীরদ প্যারিসে প্রথম একক প্রদর্শনী করেন। সেই প্রদর্শনী সেখানে প্রশংসা কুড়োলেও নীরদ কিন্তু মোটেও সন্তুষ্ট হননি। কারণ

তখনও তিনি কাঙ্খিত চিত্রভাষা পুরোপুরি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ১৯৫৮-তে নীরদ যখন ভারতে ফিরে আসেন তখন তিনি শিল্পী হিসেবে নিজের পথ খুঁজে পেয়েছেন, হয়ে উঠেছেন অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী। বারো বছরের বিদেশবাস তাঁকে যেন অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছিল।

নীরদ মজুমদারের ছবির জগৎ তত্ত্বময়। তাঁর মতে পৃথিবীর সমস্ত বিষয়বস্তুই মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গত। নীরদের ছবির বিষয় ভারতীয়, কিন্তু রীতিতে কিছুটা ফরাসি। তাঁর রেখার তীক্ষ্মতা, কৌণিকতা, বর্ণলেপন ইত্যাদি মন দিয়ে লক্ষ্য করলে সেটা বোঝা যায়। অনেকে বলেন তাঁর ছবিতে একটা টানাপোড়েনের সংকট লুকিয়ে আছে। সেই টানাপোড়েনটি হল ইওরোপীয় শরীরের সঙ্গে ভারতীয় আত্মার দ্বন্দ্ব। তবে নীরদের ছবির ড্রয়িং বরাবরই অসম্ভব জমজমাট। সেজন্যই বোধহয় দশমহাবিদ্যা, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনি, কথাসরিৎসাগর, চন্দ্রকলাবিদ্যা, তন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে ছবি আঁকলেও তা কখনও প্রচলিত ভারতীয় চরিত্রের ছবির মতো হয়নি। তাঁর ছবির ফিগারেরা সর্বদা ঋজু ও টানটান। তারা কখনও সৌন্দর্যসর্বস্ব নয়, লাবণ্যের ভারে তারা লুটিয়ে পড়ে না নব্যবঙ্গীয় চিত্ররীতির মতো। মহাজাগতিক চিন্তা ও চেতনার জন্যই হয়তো নীরদের ছবির জ্যামিতি এত সুসংবদ্ধ। কারণ মহাজগতের বিন্যাস তো আসলে একটি অন্তহীন নিখুঁত জ্যামিতি। তাঁর ছবিতে অনেক প্রতীকি ব্যাপারও আছে। আছে রং সম্পর্কে আশ্চর্য সংযম ও পৌনঃপুনিকতা।

সাহিত্যের প্রতি নীরদ মজুমদারের একটা টান ছিল। দাদা কমলকুমার মজুমদারের পরোক্ষ প্রভাবও কাজ করতো নিশ্চয়ই। নীরদ একসময়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে ভক্তকবি রামপ্রসাদের গানের ফরাসি অনুবাদ করেছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগ্মকাব্যগ্রন্থ *সুন্দর রহস্যময়*-এর জন্যও নীরদ একাধিক ছবি এঁকেছিলেন। যেগুলিকে নিছক অলঙ্করণ বলা যাবে না কোনোভাবেই। মৃত্যুর চারবছর আগে *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনি লিখেছিলেন আত্মজীবনীমূলক রচনা *পুনশ্চ পারী* । ১৯৮২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আনন্দ পাবলিশার্স থেকে সেটি বই আকারে প্রকাশিত হলেও বহুদিন ধরেই বইটি আর পাওয়া যায় না। শিল্পীর শতবর্ষে এই আত্মকথার পুনঃপ্রকাশ অত্যন্ত জরুরি।

এই রচনার দ্বিতীয় আলোচ্য শিল্পী মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শতবর্ষে উপনীত এই শিল্পীর নাম আজ প্রায় বিস্মৃতই বলা যায়। বোধহয় তাঁর অন্তর্মুখী, প্রচারবিমুখ স্বভাবের জন্য তাঁকে ভুলে যাওয়া এত সহজ হয়েছে। অথচ তাঁকে মনে রাখার যথেষ্ট কারণ ছিল। মাণিকলাল নতুন এক চিত্রমাধ্যমের প্রতিষ্ঠাতা। সিল্কের কাপড়ের ওপর জলরং-এর প্রয়োগে তিনি বিশেষ এক রকমে ছবি আঁকতেন অসাধারণ দক্ষতায়। এই পদ্ধতি তিনি শিখিয়েছেনও অনেকজনকে। মাণিকলাল আবিস্কৃত এই মাধ্যমে অনেক শিল্পীই এখন ছবি আঁকেন, কিন্তু তাঁর কথা আর কেউ বিশেষ বলেন না। শিল্পী হিসেবে তিনি যেমন সার্থকতা লাভ করেছিলেন, তেমনি শিক্ষকের ভূমিকাতেও তাঁর অবদান নেহাৎ কম নয়। গভর্ণমেন্ট আর্ট

স্কুল ও কলেজে তিনি সুদীর্ঘকাল ছবি আঁকা শিখিয়েছেন। ছাত্র-দরদী শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত সুনাম ছিল তাঁর। মাণিকলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র হলেন এ যুগের কিংবদন্তী শিল্পী গণেশ পাইন। ছাত্রাবস্থায় গণেশ পাইন যখন তাঁর ড্রয়িং-এর দুর্বলতা নিয়ে হতাশাগ্রস্ত, তখন তাঁকে নানাভাবে প্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন তিনি। এমনকি আর্ট কলেজের প্রদর্শনীতে গণেশ পাইন যখন ছবির দাম সংকোচবশত দশটাকা রেখেছিলেন, তখন মাণিকলাল সেটাকে বাড়িয়ে দিয়ে একশো টাকা লিখে দেন এবং ছবিটা অনায়াসে বিক্রিও হয়ে যায়। অল্পবয়সিদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে মাণিকলালের কোনো জুড়ি ছিল না। এমন শিক্ষক যে কোনো যুগেই বিরল।

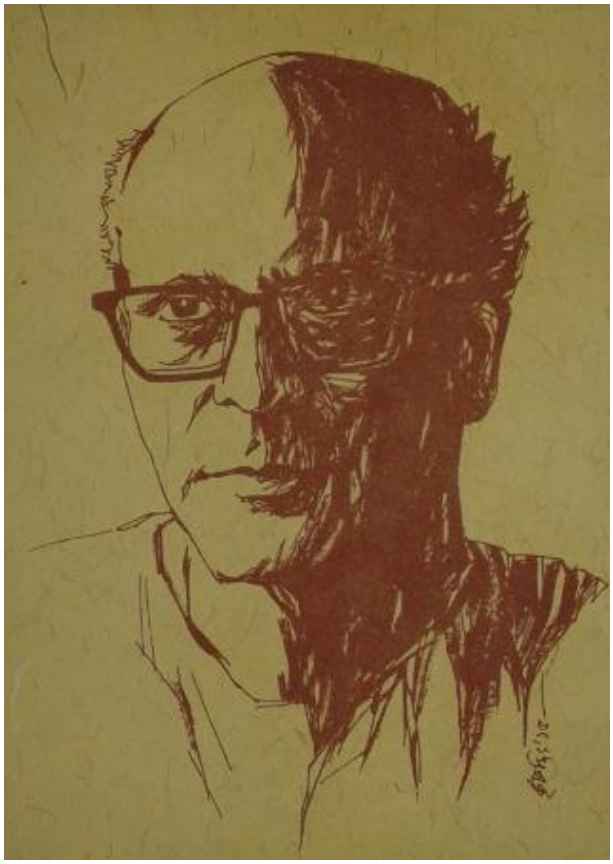

মাণিকলালের জন্ম বরিশালের কেওড়াগ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশে)। মা অমিয়বালা দেবী। বাবা জিতেন্দ্রনাথ ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঢাকার সোনারং হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে আর পড়াশোনায় মন বসেনি মাণিকলালের। সোজা কলকাতায় গিয়ে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন তিনি। সেখানে পাঁচবছর ছবি-আঁকা শিখে ১৯৩৯-এ তিনি সেখানেই শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে গভর্নমেন্ট স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হলে মাণিকলাল সেখানে ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বিভাগের অধ্যাপক হন। আজীবন তিনি এখানেই অধ্যাপনা করেছেন।

মাণিকলালের চিত্ররীতি ছিল ভারতীয় ধারার। তবে প্রথাগত পুরাণনির্ভর ছবি তিনি আঁকতেন না মোটেও। তাঁর ছবিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নানাভাবে ফুটে উঠেছে। কলকাতার রাস্তায় যাযাবরদের ছবিও যেমন এঁকেছেন, তেমনিই এঁকেছেন মধ্যপ্রদেশের গ্রামজীবনের ছবিও। সে-সব ছবিতে একদিকে ধরা পড়েছে রং ও কম্পোজিশনের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, অন্যদিকে প্রস্ফুটিত হয়েছে জীবনের সহজ ছন্দ, দিনযাপনের খুঁটিনাটি দিকগুলি। তিনি বেশিরভাগ ছবিই আঁকতেন জলরং ও টেম্পেরায়। রেশমের ওপর জলরঙে ছবি আঁকার নতুন রীতিটির কথা তো আগেই বলেছি। এই মাধ্যমটি ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। এই রীতিতে তিনি বেশ কিছু অসামান্য ফুলের ছবি এঁকেছিলেন। ভারতীয় শৈলীতে ছবি আঁকলেও পাশ্চাত্য-রীতির স্বাভাবিকতা আশ্রিত ছবি আঁকাতেও মাণিকলালের দক্ষতা ছিল অপরিসীম। বিশেষত মানবশরীরের অ্যানাটমি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল পরিষ্কার।

জন্মশতবর্ষে মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য চারুকলা পর্ষদ অতি সম্প্রতি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এখন প্রয়োজন তাঁর ছবির একটি উপযুক্ত সংকলন বের করা। তাহলে মাণিকলালের কাজের স্বরূপ সম্পর্কে আজকের প্রজন্ম আগ্রহী হবে, যা কিনা খুব জরুরি।

এই আলোচনার তৃতীয় ও শেষ শিল্পী হলেন খ্যাতনামা ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী। মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও শিল্পী ও শিক্ষক দুই পরিচয়েই সমান ভাস্বর। শঙ্খ চৌধুরীর পোশাকি নাম ছিল নরনারায়ণ। তাঁর জন্ম দেওঘরে হলেও শৈশব ও বাল্যশিক্ষা ঢাকায়। তিনি ছিলেন কিরণময়ী দেবী ও নরেন্দ্রনারায়ণের কণিষ্ঠ পুত্র। ঢাকায় কৈশোরজীবন অতিবাহিত করে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী থেকে বি.এ. পাশ করেন। তারপর সেখানেই কলাভবনে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের কাছে ভাস্কর্য শিক্ষার পাঠ নেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃতী ও গুরু রামকিঙ্করের বিশেষ স্নেহভাজন। ১৯৪৫ সালে রামকিঙ্কর শঙ্খকে নিয়ে নেপালে যান। সেখানে গিয়ে একটি যুদ্ধ-স্মারক গড়ার সময় তিনি রামকিঙ্করকে সহযোগিতা করেন। নেপালে থাকার সময়েই শঙ্খ সেখানকার প্রথাগত ধাতু-ঢালাই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন।

শঙ্খ চৌধুরীর শিল্পী জীবন শুরু হয় মুম্বইয়ে। ১৯৪৯-এ সেই শহরে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। তারপর তিনি ইওরোপ-ভ্রমণে যান। শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি একে একে দেখেন প্যারিস, লন্ডন সহ ইতালি, সুইৎজারল্যান্ড, বেলজিয়ম ও নেদারল্যান্ডের শিল্পকেন্দ্রগুলি। দেশে ফিরে কয়েকবছর বাদে ১৯৫৭-তে বরোদার সয়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে শঙ্খ রিডার হিসেবে যোগ দেন। এখানেই তিনি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত একটানা অধ্যাপনা করেছেন, তৈরি করেছেন অসংখ্য শিল্পী। এছাড়াও তিনি নানাসময়ে যে সমস্ত উচ্চ সম্মানের পদ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হল যথাক্রমে ললিতকলা অ্যাকাডেমির অনারারি সেক্রেটারি (পরবর্তীতে এখানেই চেয়ারম্যানও হন), বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রোফেসর, বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো এবং তানজানিয়ার ডার-এস-সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। জীবনে অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি – পদ্মশ্রী (১৯৭১), বিশ্বভারতী প্রদত্ত অবন-গগন

পুরস্কার (১৯৭৯), দেশিকোত্তম (১৯৭৮), কালিদাস সম্মান (২০০২)। এছাড়াও ফিলিপিন্স-এর সেন্টার এস্কোলার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট (১৯৭৪) ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট (১৯৯৭) প্রদান করে।

ভাস্কর হিসেবে শঙ্খ চৌধুরী ছিলেন মুক্তমনের এবং আধুনিক চিন্তার মানুষ। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, মাধ্যম সবকিছু নিয়েই নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে থাকতেন তিনি। নির্দিষ্ট কোনো ঘরানায় বিশ্বাস ছিল না তাঁর। প্রতিটি কাজেই নিজের করা আগের কাজটিকে অতিক্রম করতে চাইতেন। শিক্ষক রূপেও ছিলেন অতুলনীয়। শিক্ষার্থীদের মনের ওপর কোনো ধারণা বা মতামত জোর করে চাপিয়ে দিতেন না তিনি। শঙ্খ চৌধুরী ছিলেন এমনই এক ভাস্কর যিনি বিশ্বশিল্পের গতিপ্রকৃতিকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে, তাকে নিজের মননে ও চিন্তায় ধারণ করেছিলেন। তাই তাঁর কাজকে কোনো তত্ত্বের মধ্যে ফেলে বিচার করলে ভুল করা হবে। শঙ্খের ভাস্কর্যে একদিকে যেমন গুরু রামকিঙ্করের চেতনা লুকিয়ে আছে, তেমনিই অন্যদিকে নিহিত আছে ব্রাঁকুসির ভাস্কর্যের মসৃণ বিমূর্ততা। বস্তুর আকৃতিকে তিনি সরলতা দান করে তার অন্তরের রূপটিকে প্রকাশিত করতে চাইতেন। আবার কোনো ব্যক্তির মুখাবয়ব নির্মাণ করার বেলায় শঙ্খ বেছে নিতেন অমসৃণতা। মার্বেল, পোড়ামাটি, ধাতু, কাঠ, সিমেন্ট সব মাধ্যমেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। এমন আন্তর্জাতিক মানের একজন ভাস্কর জন্মশতবর্ষে উপনীত হয়ে আরো বেশি চর্চিত ও আলোচিত হয়ে উঠবেন এটাই কাম্য।

চিত্র পরিচিতি : ১। নীরদ মজুমদার; ২। মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; ৩। শঙ্খ চৌধুরী।